মিরা—তুমি ফিরে এসো

কাঞ্চনের শরীরে হালকা কাঁপন লাগলো। মেয়েদের কণ্ঠ এমন সুন্দর ও সংগীতময় হতে পারে ওর জানা ছিলো না। টেলিফোনের রিসিভার ধরে ধমকে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো হঠাৎ আঁতকে উঠে ব্রেককষা কোন গাড়ির ড্রাইভার। যোগাযোগ, তাও আবার ক্রস কানেকশনে। মনে মনে বললো—টিএন্ডটি, তোমাকে ধন্যবাদ। রিনরিনে গলায় ওপাশ থেকে কেউ বলছে প্লিজ, দয়া করে ইন্টারফেয়ার করবেন না, আমি কথা বলছি।

কাঞ্চন এখনও চুপ করে আছে। আবারও অনুরোধ, মাঝখানে যিনি ঢুকেছেন, দয়া করে রাখুন, আমি কিছু জরুরি কথা বলছি।

কাঞ্চন অভিভূত গলায় বললো—আপনার গলা খুব মিষ্টি, মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে শুনি এবং শুনতে থাকি। টেলিফোন রাখতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু রাখছি। আপনার মিষ্টি কণ্ঠ শোনার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে চাই। আর হ্যাঁ, আমি কাঞ্চন, যদিও আপনি জানতে চাননি।

অন্য প্রান্তের কণ্ঠে উষ্মা। আপনি কাঞ্চন হলে আমি হীরা। আমার বান্ধবীর সাথে কথা বলছি এবং ফর ইওর ইনফরমেশন, খুবই দরকারি। আপনি টেলিফোন না রাখলে আমি কষ্ট পাব।

কাঞ্চন ওর টেলিফোন নম্বরটা বললো ধীর কণ্ঠে। পর পর দু'বার ৮৯৯১০৭২। তারপর বললো—যদি আপনার সময় হয় ফোন করবেন প্লিজ। আমি অপেক্ষা করবো। শুনে রাখুন, আপনাকে আমি কোন ভাবেই কষ্ট দিতে চাই না। বলে টেলিফোন রাখলো কাঞ্চন।

মনে মনে ভাবলো, না কাজটা বোধ হয় ঠিক হলো না। ঠিকানাহীন ও মেয়ের টেলিফোন নম্বরটা অন্তত নেয়া উচিত ছিলো। কাঞ্চন ভাবল, ওর জীবনের এ আর এক মস্ত ভুল। ক্রস কানেকশনে কে-ই বা কাকে চেনে? কতক্ষণই বা মনে রাখবে! না হয় বিরক্তই হতো মেয়েটা। ওর তো হীরাকে হারানো ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং সে তো হারিয়েই গেলো ! একটা অচেনা ব্যথা বারবার ওর বুকটাকে ভরে তুললো।

কাঞ্চন সুপ্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী। বয়স পঁয়ত্রিশ ছুঁই ছুঁই করছে, কুমার। ওর একই কথা, যদি ভালবাসা না হয় তা হলে বিয়ে করে কি-ই বা লাভ। সেই ভালবাসা কি এতোদিনে ওর জীবনের অলিন্দে প্রথম ফোটা ফুলের মতো সৌরভ ছড়াতে শুরু করেছে!

অফিসে অন্যমনস্ক হলো কাঞ্চন। সেখানে ওকে খবরদারি করার মতো কেউ নেই। কারণ ও নিজেই বস। একটা ডিসিশন দিতে গিয়ে ভুল করে বসলো। দু'জনার সাথে বিনা কারণে রূঢ় ব্যবহার করলো। ম্যানেজার এসে একবার বললো—স্যার, আপনার শরীর কেমন যাচ্ছে?

কাঞ্চন তার দিকে ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকিয়ে বললো—কেন?

স্যার, আপনার মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। সম্ভবত আপনার বিশ্রাম দরকার।

তাতে আপনার কোন অসুবিধা হয়েছে? কাঞ্চনের কণ্ঠে বিরক্তি।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বসের দিকে তাকালো। তার পরিচিত হাসিখুশি অমায়িক মানুষটা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে। অফিসের দু'একটা ব্যাপারে আলোচনা করে চলে গেলো সে।

আজ সাতদিন। হীরা নামের মেয়েটি ওকে একবারও টেলিফোন করেনি! কাঞ্চনের তিনকুলে কেউ নেই বলে ঝঞ্ঝাটও কম। অফিসের কেয়ারটেকারই সবকিছু করে দেয়। মাঝে মধ্যে ওর দূর সম্পর্কের এক খালা এসে থাকে দু'চারদিন, আবার চলে যায় কাজ সেরে। তবে কলেজ-ভার্সিটি জীবনের ক'জন বন্ধু-বান্ধব আছে যাদের নিয়ে মাঝে মধ্যে আড্ডা দিতে ওর ভালই লাগে, ওরাও আসে। তবে ক'দিন ধরে তাদেরও কোন পাত্তা নেই। ব্যস্ত ঢাকা শহরে হয়তো যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চমকে উঠলো কাঞ্চন। আরে ! ও তো ক'দিন ধরে সেভ করছে না! আবার গা ছাড়া ভাব চলে এলো দেখতে দেখতে। আর কি হবে সুন্দর হয়ে! ওর জীবনে হীরা নামের সুকণ্ঠি মেয়েটি হারিয়ে গেলো। নিজের ভাবনায় নিজেই চমকালো। মরীচিকা নয়তো! এলোই বা কখন যে হারাবে!

কাঞ্চন প্রচুর পড়াশোনা করে। অভ্যাসটা পেয়েছে ওর আব্বা-আম্মার কাছ থেকে। স্কুল শিক্ষক পিতা কিছু করতে না পারলেও ওর মাঝে জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়ে তুলেছিলেন। শিখিয়েছিলেন একজন ব্যক্তির উত্তম সংগী হলো বই। কাঞ্চন বাবার শিক্ষক জীবন সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। এ ব্যাপারে ওর শক্তি হিসাবে কাজ করেছে ওর মা'র বই পড়ার ঝোঁক। ও এখন রীতিমতো পড়ুয়া, বইয়ের অরণ্যে সবকিছু ভুলে যেতে পারে নিমিষেই।

হীরাকে ভুলতে নিজের ব্যক্তিগত পাঠাগারে ঢুকলো আজ। এটা সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে রোমিও জুলিয়েট বইটা তুলে নিলো হাতে। টেলিফোন বাজছে একবার দু'বার, তিনবার। না.....বিরক্ত হলো কাঞ্চন। রাত এগারোটা। এতো রাতে টেলিফোন, কে হতে পারে? হঠাৎ আবার সাড়াহীন হলো ওটা। বইয়ের র‍্যাকে হাত বাড়ালো আবার। মন নতুন কিছু খুঁজছে। আবার বাজতে শুরু করেছে টেলিফোন। স্টাডি ছেড়ে দ্রুত চলে এলো ড্রয়িং রুমে। টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে স্বভাব সুলভ গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হ্যালো।

২

কাঞ্চন সাহেব আছেন?

কাঞ্চনের শরীরে একটা হালকা আনন্দ স্রোত বয়ে যেতে লাগলো। সেই মিষ্টি মনকাড়া রিনরিনে কণ্ঠ, কী যে যাদু আছে সেখানে।

হীরা, আপনি?

হীরা কে ওপাশের কণ্ঠে অবাক বিস্ময়!

হীরার বিস্ময়, কাঞ্চনের মনে হলো একঝাঁক শুভ্র হংস পালক যেনো ঢেকে ফেললো হেমন্তের আকাশ।

কেনো, আপনি তো সেদিন আমাকে আপনার নাম হীরা বললেন। আমি আপনার কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পেরেছি যে আপনি হীরা।

খিল খিল হাসিতে ওপাশে ভেঙে পড়লো কেউ।

কাঞ্চন সম্মোহিত। বললো—হীরা, আপনি এতো সুন্দর করে হাসেন!

হীরা না, আমি মিরা, নিশ্চয় কাঞ্চন সাহেব বলছেন।

হ্যাঁ। বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় কাত করলো কাঞ্চন। বললো—তাহলে আপনার নাম সেদিন হীরা বললেন যে।

রেগে। বুঝলেন না সাহেব? একদম রেগে গিয়েছিলাম, মাথার ঠিক ছিলো না। বান্ধবীর সমস্যার সমাধান করছিলাম। তাই যা মুখে আসে তাই বলে বসেছি। আপনি কাঞ্চন বলায় আমি হীরা বলেছি। বলে আবার হাসতে শুরু করলো মিরা।

হয়েছে সমাধান? কাঞ্চন নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো।

এবারের মতো হয়েছে। তবে আবারও ঝামেলায় পড়বে না সে কথা বলতে পারছি না। মিরা গম্ভীর।

তা এতো দিন টেলিফোন করেন নি কেন? কণ্ঠে কিছুটা অনুযোগ।

মিরা হেসে ফেললো। বললো—মনে হয় আমরা অনেক দিনের চেনা, আসলে কী তাই? আমি তো আপনাকে দেখিই নি, তবে আপনার সেদিনের অনুরোধে এমন কিছু ছিলো যে উপেক্ষাও করতে পারি নি। তা না হলে হয়তো কোন দিনও টেলিফোন করা হতো না।

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন অনুমতি দিন তুমি করে বলি আপনাকে, কেমন? আর তুমি কী দয়া করে আমাকেও তুমি করে বলবে?

কি ভাবে! দশ পনের মিনিটের টেলিফোন আলাপে আমরা কী এতোটাই কাছাকাছি এসে গেছি যে আপনাকে তুমি বলবো। তাছাড়া আপনি কে? কি পরিচয়? বয়স কত? কিছুই জানি না মিরা বিস্মিত।

তোমার কী আমার ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করছে? বয়স, কি করি, কোথায় থাকি? আর তুমি কী এই যোগাযোগের মধ্যে বয়সটাকে প্রাধান্য দিচ্ছ?

দেব না কেন? দেয়া উচিৎ নয় কী? আপনি কী বলেন? অচেনা অজানা লোককে কেউ কী তুমি করে বলে? মিরার গলায় আবার খিল খিল হাসি। অনেকগুলো প্রশ্ন। কাঞ্চন কিছুটা বিব্রত। অচেনা মেয়েদের সাথে ও কখনো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না।

ওর বন্ধুরা ওকে বলতো কা-পু যার পুরো অর্থ কাহিল পুরুষ। কেউ কেউ আবার ফান করে বলতো ব্যাটা ভীতু, দেখবি একদিন বিপী হয়ে ছাড়বি। বীপি কি জানতে চাইলে ওর কলেজ-জীবনের বন্ধুরা সবাই একযোগে হো হো হেসে উঠেছিলো। একজন হাত তালি দিয়ে টেনে টেনে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললো-বী.....পি, বীর পুরুষ। অন্যজন বললো—আরে মিয়া হেউডাও জান না? এটা হলো ব্যর্থ প্রেমিক। আবার এক পশলা হো হো হাসির দমকে আড্ডা জমে উঠতো বেশ। সেই মুখচোরা কাঞ্চন লাজুক ছিলো আজ পর্যন্ত। কোত্থেকে ওর এতো সাহস আসছে নিজেও জানে না। শুধু স্রোতের মতো ওর বয়ে যাওয়া আবেগকে গুছিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে।

মিরার কথার জবাবে কাঞ্চন বললো—অচেনা লোককেও তুমি করে বলে, বলা যেতে পারে যদি তুমি বলো। অচেনা থেকেই চেনা লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে কর আমি তোমার অনেক দিনের চেনা, সেই অচেনা বন্ধু, যাকে তুমি করে বলা যায়।

আইডিয়াটা মন্দ না। আর হ্যাঁ, টেলিফোন দেরিতে করার জন্য দুঃখিত। আপনার নম্বরটা ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আবারও হারাবে নাকি?

না। মিরা হাসছে। বললো—এতো কথার পরে বন্ধুর টেলিফোন নম্বর হারাই কী করে?

কাঞ্চনের ভারি কণ্ঠে হাসি ফুটলো। বললো—যে ভাবে আগে হারিয়েছিলে। তবে তুমি হারালেও আমি যাতে না হারাই তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তোমার নম্বরটা আমাকে দেবে?

আবার হাসির শব্দ। কাঞ্চনের চোখ আবেশে বুজে আসছে। মিরা বললো—বাবা কিংবা মা'র হাতে পড়লে আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ। খুবই কনজারভেটিভ ফ্যামিলি, শেষ হয়ে যাবো একেবারে।

কিছু কিছু জিনিস কখনো শেষ হয় না, শেষ হতে পারে না। তোমার সাথে কথা বলে তোমাকে আমি কল্পনা করে নিয়েছি। তুমি হাসিখুশি সরল ও চঞ্চল মেয়ে। যে কোন পরিবেশের সাথে নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নিতে পার। কাঞ্চনের কণ্ঠ উৎফুল্ল।

ভাল কথা বলেন দার্শনিক সাহেব, আমি কিন্তু এখনো আপনাকে কল্পনার চোখে দেখিনি। মিরার চপল জবাব।

মিরা। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো কাঞ্চন।

থামলেন কেন?

আমি তোমার যোগসূত্র হারাতে চাই না। দয়া করে তোমার ঠিকানাটা দেবে! কাঞ্চন সিরিয়াস।

নিয়ে কী হবে? মিরার গলা উদাস।

তুমি কী কর? কাঞ্চন জিজ্ঞেস করলো।

ভার্সিটির পরীক্ষা শেষ, এখন ফলাফলের অপেক্ষা। হতে পারে বাবা ও মা হয়তো পাত্র খোঁজাও শুরু করেছেন। তবে সব হবে আমার অজান্তে। এখানে কারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন দাম নেই। মিরার কণ্ঠে হতাশা স্পষ্ট।

দ্রুত সহজ সমাধান দিও না। তোমার বেলায় হয়তো তা হবে না। আচ্ছা বলো তো তুমি কোন সাবজেক্টে পড়াশুনা করলে? জিজ্ঞেস করলো কাঞ্চন।

বাংলা।

আমি অবশ্য ইকোনোমিক্সের ছাত্র ছিলাম, তবে আমার বাবার গুণে গুণান্বিত হয়ে একরাশ বইয়ের মাঝে বসে থাকি।

হাসছে মিরা। বললো—ভাল, তবে খেয়াল রাখবেন, বসে থাকতে থাকতে না আবার শিকড় গজিয়ে যায়।

হেসে ফেললো কাঞ্চন। বললো—মিরা, তোমাকে দেখিনি, তবে তোমার কণ্ঠ আমাকে বশিভূত করেছে। একদিন দয়া করে দেখা দেবে?

দিতে পারি। আবার মিরার হাসি। একটু থেমে বললো—তবে আপনি কী চান আমার মাথাটা ঘাড় থেকে এককোপে কেউ দু'ভাগ করে ফেলুক?

কাঞ্চনের কণ্ঠে বেদনার ছোঁয়া। বললো—কখনো না। আমি চাই তুমি একগুচ্ছ গোলাপের মতো সব সময় সজীব এবং প্রাণবন্ত থাক।

মিরা ধীরে ধীরে বললো—আমারও মনে হয় আপনার সাথে একবার দেখা করি। কিন্তু ভয় আমার পুরো পরিবারকে। অত্যন্ত কঠোর শাসনে বড় হয়েছি। মেনে এবং মানিয়ে চলতে হয় সকলকে।

কাঞ্চনের কণ্ঠে হাসি খুসি ভাব। বললো—বিংশ শতাব্দীতে! এতোটা মেনে চলতে তোমাকে কেউ বাধ্য করতে পারবে? নাকি তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ!

না, তা চাইছি না। বলতে বলতে হঠাৎ করেই লাইন কেটে দিলো মিরা। যেন কিছু একটা এই ছিলো এবং দৈবযোগে হঠাৎ নাই হয়ে গেলো।

আচ্ছন্নের মতো রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকলো কাঞ্চন।

কাক ডাকছে ভোরের আলো আঁধারির খেলায় পৃথিবী আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে। কিন্তু কাঞ্চন সম্মোহিতের মতো রিসিভার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে!

৩

এরপর দিন এবং মাস গড়িয়েছে। মিরার কণ্ঠে আবেগের ছোঁয়া পেয়ে পাখির পালকের মতো সুখে বিভোর হয়েছে কাঞ্চন। অনেক অনুরোধে রাজি হয়েছে মিরা। দেখা দেবে। আজ সেই দিন, মিরা বলেছে ক্রিসেন্ট লেকের কাছে আজ বিকালে আসতে।

এসেছে কাঞ্চন। হেমন্তের পড়ন্ত রোদ আরো ঝুলে পড়ছে। লেকের পানিতে ভাসছে ক'টা হাঁস। অনেকগুলো লাল শাপলা ফুটে আছে একসংগে, যেন জোট বেঁধে বনভোজনে বসেছে ওরা। চারদিকে কপোত কপোতির মেলা বসেছে। তবুও কাঞ্চনের মনে হলো ও বড্ড একা।

মিরার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে খেয়াল করেনি কাঞ্চন। সোডিয়াম লাইটগুলো হলুদ চোখ মেলে তাকাতে তাকাতে কিছুক্ষণ পর কমলা রঙের উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়ে ছিল রাজপথ। লোকজনের কোলাহল এখনও থামেনি। এক তরুণী ঠোঁটে লাল লিপস্টিক আর খোঁপায় বেলি ফুলের মালা নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলো। মনে হলো সে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। কাঞ্চন এখনো একমনে দেখছে লাল শাপলা। যেন পানির বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ওগুলো। না, তা সম্ভব নয়। ওরা বেরোতে চাইলেও পারবে না, মরে যাবে। ঐ পরিবেশেই ওদের বড্ড সুন্দর লাগছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো কাঞ্চন। না, মিরা কথা রাখেনি!

এক্সকিউজ মি। পিছনে খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেউ।

সেই রিনরিনে আবেশ করা মিষ্টি কণ্ঠ। মিরা এসেছে। চমকে উঠে কাঞ্চন। দেরি হলেও ঠিকই এসেছে মিরা!

মিরা তুমি এসেছ! বলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল কাঞ্চন।

দেখলো কাঞ্চন, ফর্সা দীর্ঘাঙ্গি মিরা লাল কাতান পরে দাঁড়িয়ে, হাতে মেহেদির রঙ, কেমন যেন বউ বউ সাজে। যেন পাপড়ির বাঁধন খুলে বেরিয়ে এসেছে রাতের একরাশ রজনীগন্ধা।

হ্যাঁ, মাথা উঁচু নিচু করে বললো মিরা। বললো—দুঃখিত, হঠাৎ করে আমাকে দেখতে লোক চলে এলো। বাবার ইচ্ছে, মানা করার সাহস আমার নেই, তাই বসতে হলো। আমাকে এখনই আবার ফিরতে হবে।

কাঞ্চনের বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়লো যেন। সব আনন্দ হঠাৎ বিষাদের মেঘে ভরে উঠলো। ধরা গলায় বললো—তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা কিংবা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে রাজি। শুধু ঘন্টা, দিন আর মাস নয়, বছরের পর বছর ধরে।

না। মাথা নেড়ে কথা বললো মিরা। চোখে পানি টল টল করছে। বললো—পাকা

কথা হয়ে গেছে। আমি বাঁধা পড়ে গেছি। এখান থেকে ফিরেই বসতে হবে বিয়ের পিঁড়িতে। ছেলে দুবাইতে সেলসম্যান।

কাঞ্চন এগিয়ে এসে ধরলো ওর হাত দু'টো। বললো—তুমি আমার জীবনের প্রথম ভালবাসা। তোমাকে হারাতে চাই না। আমাকে দেখে তোমার যদি ভরসা হয় চলে এসো, আমার আপন ভুবনে। সেখানে তোমাকে, তোমার স্বাধীনতায় কেউ বাধ সাধবে না। শুধু থাকবে ভালবাসা, সীমাহীন, সাগরের মতো।

কাঁদছে মিরা। টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে ওর চোখের জল মুক্তার দানার মতো। বললো—কেন এলে না আরো খানিকটা আগে! কেন সাহস দিয়ে কাছে টেনে নিলে না!

কাঞ্চন ধরা গলায় বললো—হয়তো নিয়তি। তবে তাকে বদলানোর জন্য আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি, এখনো সময় আছে।

নিয়তি কখনো বদলে না, বদলান যায় না। মিরার গলা কান্নায় বুজে এলো। বললো—হয়তো আমরা খেলাচ্ছলে দেরি করে ফেলেছি।

আমি তোমার আব্বার সাথে দেখা করবো। দৃঢ় কণ্ঠ কাঞ্চনের।

না, না! ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো মিরা। ওরা আমাকে মারবে, মেরে ফেলবে। আমার ভাইরা সবাই সৎ ভাই। আর বাবা! আমার দুর্ভাগ্য, তিনি মা'র কথায় ওঠেন বসেন।

কাঞ্চন মিরার হাত দু'টো ধরে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বললো—চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।

না, আমার সে সাহসও নেই। তোমাকে আমার সাথে নেয়া যাবে না। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল মিরা।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে মিরা। চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যতক্ষণ দেখা যায় মিরাকে, তাকিয়ে থাকলো কাঞ্চন।

এক সময় নাই হয়ে গেল মিরা!

মিরা নেই, মিরা হারিয়ে গেছে! যেন দেখা দিয়েছিলো মেঘের ফাঁকে উঁকি দেয়া একরাশ জ্যোৎস্না! আবার তাকে আড়াল করেছে চাপচাপ মেঘ! হঠাৎই মনে হলো ক্রিসেন্ট লেকের সব সোডিয়াম লাইট আর্তনাদ করে ছোটাছুটি করেছে। ওরা যেন জীবন্ত সব। রাতের হালকা অন্ধকারে বৃক্ষেরা মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করছে! দলছুট হালকা কুয়াশার দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সোডিয়াম লাইটগুলো এঁকেবেঁকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলছে—মিরা, তুমি ফিরে এসো। বৃক্ষরাজি একযোগে আর্তনাদ করে উঠলো, ফিরে এসো মিরা! কোত্থেকে উদয় হলো এক ঝাঁক রাতজাগা পাখি। ওরা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কাতর কণ্ঠে ডাকলো—মিরা, তুমি ফিরে এসো! এবং হঠাৎ লাল শাপলাগুলো জলের বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে এসে একযোগে চিৎকার করে বললো—মি.....রা, মি-মি.....রা.....রা.....তুমি ফিরে এসো!

গাধা

চাচা, লাঙ্গল চলে না। এবার গরুগুলা ঠিকমতো খায় নাই। সোলায়মান তাকালো ছোট মোল্লার দিকে। সে জানে মোল্লাই ওর গুরুজন। বড় মোল্লা অন্ধ, বেশ কয়েক বছর ধরে। সব কাজ ছোট মোল্লা সামলায়। বিএ পাশ করার পরে সংসারের হাল ধরেছে সে, বড় মোল্লা, অন্ধ হবার পর পরই। তা না হলে সব উচ্ছন্নে যেতো এতো দিনে।

গুরুজনের নাম মুখে নিতে নেই, সোলায়মানের বাপজান ওকে শিখিয়েছেন। ছোট মোল্লার পুরো নাম রউফ উদ্দিন মোল্লা। সংক্ষেপে রউফ বলে কেউ ডাকলে সে কানে আঙুল দেয়। যার বাড়িতে বাপ-দাদার আমল থেকে কাজ করে খায় তাদের নাম মুখে আনাও পাপ, সোলায়মান মনে মনে ভাবে।

ছোট মোল্লা হাসলো। বললো—সলু, তুই একটা গাধা।

সোলায়মান হাসলো হে হে করে। বললো—চাচাজান, তা যা কইছেন মন্দ না। অইতেও পারি গাধা। আপনি মন্দ কইলে মিঠা মিঠা লাগে।

ছোট মোল্লা বললো—তুই বাপ জানকেও চাচা ডাকিস, আমাকেও চাচা ডাকিস, কথাটা কী মেলে?

ছোট মোল্লার প্রশ্নের জবাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকায় সোলায়মান। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো—বড়জন অর্থাৎ আপনার বাপরে ডাকি চাচা—ঠিক। আপনারেও ডাকি ছোট চাচা—সম্মান দিতে অইব না? আপনি আমার মালিক না?

দাঁত কিড়মিড় করলো রউফ মোল্লা। বললো—তুই আমারে ভাইজান ডাক, গাধা। তাতেই সম্মান হবে।

না ছোট চাচা— হেইডা পারতাম না। কেমন যেন আপন আপন লাগে ভাইজান ডাকলে, তখন আর মালিক মালিক লাগে না।

আমাকে মালিক মালিক লাগা কি খুব জরুরি? রউফ তাকালো সোলায়মানের মুখের দিকে।

সোলায়মান মুখে চুক চুক করে শব্দ করলো। তারপর বললো—তওবা, তওবা। মালিকরে মালিক মালিক না লাগলে চলবে ক্যামনে? সোলায়মানের চোখে বড় একটা প্রশ্ন ঝুলে রইলো।